ধর্মহীন রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রহীন ধর্ম দুইই ধ্বংসের কারণ

আজকাল ধর্মকে রাজনীতি থেকে আলাদা করার জন্য একটা ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র চালান হইতেছে। এরজন্য সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতারা সঙ্ঘবদ্ধ হইবার জন্য প্রচার মাধ্যমগুলিকেও সাথে করিয়াছে। বেশীর ভাগ ভারতের সাধু সন্ন্যাসীরা যাহারা ঈশ্বরের নামে পেটকাওয়াস্তে ধার্মিক বেশ ধারণ করিয়া রাজনৈতিক দলের নেতাদের ভজন কীর্তন করিয়া দিন কাটান তাহারাও ধর্মকে রাজনীতির সাথে মিলাইতে নারাজ। কারণ, পার্টিবাজদের সাহায্য না পাইলে যদি খরা ও বন্যাত্রাণে খিচুড়ি বিতরণ কর্মকাণ্ড বন্ধ হইয়া যায়? বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ও একই কথার সমর্থনে তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিষ্ঠার স্বার্থে নিজেদের সেকুলার রাষ্ট্রের সেবায় নিবেদিত প্রাণ বলিয়া প্রচার করেন। কিন্তু সকলের বোঝা প্রয়োজন যে একমাত্র যবনবাদী ধর্ম যাহা সনাতন বৈদিক ধর্মের মতে অধর্ম বা অসুরবাদী ধর্ম। ইহা ছাড়া ধর্মের সাথে রাজনীতির সম্পর্ক চিরদিনই অভিন্ন কিন্তু লক্ষ্য আলাদা। অসুরবাদী ধর্ম প্রবর্তকগণই ক্ষমতা দখলের জন্য রাজনীতিকে কেন্দ্র করিয়া ধর্ম প্রবর্তন করিয়াছেন।

ধর্ম অর্থে পূর্ণ বিকাশ। ধর্মনীতি অনুশীলন দ্বারা মানব মহান হইবে এবং মহান ব্যক্তিরা রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিয়া অধর্ম ও বিকাশ বিরোধী শক্তিকে ধ্বংস করিবে। ভারতের শাসন, শিক্ষা ও চিকিৎসাবিদ্যা এই কারণেই ঋষিদের ও যোগীদের নির্দেশে ও পরিচালনায় পরিচালিত হইত। শিক্ষার স্তরে স্তরে ছাত্রগণ ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম ও নীতির ভিতর দিয়া বিদ্যা অর্জন ও যোগের অনুশীলন করিয়া দেবত্ব অর্জন করিতেন পরে সেই সমস্ত বিদ্বান ছাত্রেরা রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া দেশের ও সমাজের উন্নতি ও সেবায় আত্মনিয়োগ করিতেন। রাজনৈতিক নেতা ও রাজকর্মচারীদের ইহাই ছিল পরিত্র কর্তব্য।

সাধু সন্ন্যাসীরা মঠ মন্দির স্থাপন করিয়া সর্বস্তরের জনসাধারণকে ধর্মের বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য নানা পূজাপদ্ধতি ও বিভিন্ন জাতীয় উৎসবের মধ্য দিয়া জাতিকে একত্রিত করিতেন ও প্রকৃতি বিরোধী এবং বিকাশ বিরোধী শক্তিকে ধ্বংসকে করিবার জন্য বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তির মধ্যে যে গুপ্ত রহস্য ও চিন্তা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার সহিত পরিচয় করাইয়া সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ রাখিতেন ও রাষ্ট্রের অনুকূলে সমগ্র মানব সমাজকে জাগ্রত করিবার জন্য পূজা পাঠ যজ্ঞ ও তপস্যার কার্যে নিযুক্ত থাকিতেন। ইহার ফলে বায়ুমণ্ডল ও প্রাকৃতিক পরিবেশও অনুকূলে থাকিত এবং অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, রোগশোকজনিত মহাপাপের পরিণতি হইতেও সমাজ মুক্ত থাকিত ও সমাজের সুখ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইত। অশ্বত্থ বৃক্ষ সর্বদাই অক্সিজেন ত্যাগ করে, বটবৃক্ষ, সালবৃক্ষ সংলগ্ন এলাকা সর্বদা স্নিগ্ধ থাকে বলিয়া ইহাদের সমীপে আপনা আপনিই কতকগুলি ঔষধি বৃক্ষ জন্মে যাহা মানুষের অশেষ প্রাণদায়ী ঔষধরূপে কাজে লাগে। ধর্মশিক্ষার মধ্য দিয়া অশ্বত্থ বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা, বট বৃক্ষের মূলে দেবতার প্রতিষ্ঠা ও জল দান ও পূজা পাঠ

পরিবেশ সুন্দর রাখারই প্রচেষ্টা ছিল। বনমহোৎসব যে এসবের অন্তর্গত অনুষ্ঠান সেটা বর্তমান নেতারা অনেক পরে হইলেও বুঝিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন -

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ১৮।৬৬

সকল ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র আমার (আত্মার) শরণাগত হও, আমি (আত্মা) তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আত্মার পথে চলিতে নির্দেশ দিলেন এবং সর্বধর্ম পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। কিন্তু বর্তমান ভারতের নেতারা আত্মাকে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিয়া যদি সর্ব ধর্মের পথে চলিতে চান তবে পরিণাম কি হইতে পারে সেটা সমস্ত স্তরের জনতা ও ধার্মিক নেতাদের চিন্তা করিয়া দেখা উচিত নয় কি? ধর্ম চিরদিনই বিদ্যার পথ এবং রাজনীতি চিরদিনই সেই বিদ্যার প্রয়োগ, প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষার পথ। ধর্মহীন রাজা ও জনতা যদি ধর্মশিক্ষাকে রাজনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করেন তবে সেই চেষ্টা ও কর্মকে গীতা অসুর কর্ম ও ধ্বংসের পথ বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন।

আমরা শক্তিবাদ প্রবর্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী মহারাজের শক্তিবাদ ভাষ্য গীতার চতুর্থোধ্যায়, জ্ঞানযোগের ১৭ শ্লোক শক্তিবাদ ভাষ্য প্রকাশ করিলাম যাহাতে কর্ম্ম = শক্তিবাদীয় কর্ম্ম, বিকর্ম্ম = দুর্ব্বলবাদীয় কর্ম্ম এবং অকর্ম্ম = অসুরবাদীয় কর্ম্মের রহস্য বুঝিয়া ব্যক্তি, রাষ্ট্র ও সমাজজীবনের বিজ্ঞান বুঝিতে সুবিধা হয়।

কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ॥

১৭। কর্মের গতি আছে। (কাজেই) কর্ম কি, ইহা জান, বিকর্ম কি, উহা জান এবং অকর্ম কি ইহাও জান। কর্মের গতি গহন।

শক্তিবাদ ভাষ্য - শক্তিবাদীয় কর্ম, অসুরবাদীয় কর্ম ও দুর্ব্বলকর্ম, এই তিন প্রকার কর্মের ফল এক নহে। তুমি বড় বড় ঢাক পিটাইয়া মিথ্যা কথাকে সত্য বলিয়া চালাইয়া দুর্ব্বল কর্কে শক্তিবাদ বলিয়া চালাইতে পারো। কিন্তু দুর্ব্বল কর্মের (বিকর্মের) ফলে সমাজের যে সর্ব্বনাশ হইবে, উহা তুমি রুদ্ধ করিতে পারিবে না।

তুমি যদি মনে কর, দুর্বল বা অসুর কর্মের প্রভাবে সমাজের সর্বনাশ করিয়া নিজের পরকাল আরামে থাকিবে সেটাও হইবে না। যদি তুমি চালাকি বা চালবাজী শিক্ষা দিয়া সমাজের সর্বনাশের চেষ্টা কর, সেটা তোমার ও সমাজ উভয়ের জন্যই সর্বনাশের কারণ হইবে। তুমি এখানে বসিয়া সাধের বেহস্তের লোভ দেখাইয়া দুষ্কৃতি করিলে এবং করাইলে, উহার ফলে তোমার বা তোমার অনুগামীদের স্বর্গ লাভ হইবে না। ‘‘সমাজের গতিচক্রে তোমার দেশটা এবং বিশ্বটা ধনসাম্যে পরিণত হইয়া শেষ কালে ষ্টেটহীন (শাসনহীন) রাজ্যে পরিণত হইবে’’ প্রচার করিলে বা মূর্খগণকে এইসব মিথ্যা কথায় খেপাইলেই ধনসাম্য ও ষ্টেটহীন রাষ্ট্র হইবে না। ঐরূপ অসুরকর্মের যাহা পরিণতি (দুঃখ অশান্তি) তাহাই হইবে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ শক্তিবাদমূলক ধর্মকে সমর্থন করিতেছেন। দুর্ব্বলবাদ বা অসুরবাদমূলক ধর্মকে নহে। অর্জুন ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনে

জীবিকা চাহিয়াছিলেন; সেটা কি কর্ম নহে? সেটা কি তিনি আত্মজ্ঞ পুরুষের মত ভান করিয়া করিতে পারিতেন না? আমাদের তো মনে হয়, অর্জুন ইচ্ছা করিলে বেশ ভাল ভাবেই ভান করিতে পারিতেন। তিনি বিরাট রাজার বাড়ীতে কত সব নৃত্য গীত করিয়াছিলেন। সেইসব করিলে তো কত শিষ্য, কত মঠ, কত দোকানদারীর দল জুটিয়া ধর্ম সংস্থাপনার গুরুই তিনি হইতে পারিতেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সেই সব কথায় একটু উস্কানী দিলেই তো পারিতেন। অর্জ্জুন সে সব সঙ দেখাইয়া নবীন ধর্ম স্থাপনা করিলে, স্বর্গে তিনি যাইতেন কি না সেটা এ জগতের কে জানিত? কিন্তু ফুল, বাতাসা, জল, ভোগ ও নৈবেদ্যযোগ তাঁহার নামে মঠে মঠেই জুটিত। আমরা জল, ফুল ও নৈবেদ্যের বিরুদ্ধে নহি; কিন্তু জানিয়া রাখিও, শক্তিবাদীয় ধর্মই জীবনকে ও সমাজকে বিকশিত করিতে ও শান্তি দিতে সক্ষম, অসুরবাদ ও দুর্বলবাদ ধর্মের গতি ইহার বিপরীত। এই শ্লোকে কর্মের গতি সম্বন্ধে বলিলেন - কর্মের গতি উপেক্ষা করিয়া দুর্বল ও অসুরবাদে মত্ত হইলে লাভ নাই।

কাজেই আমাদের মনে হয় রাষ্ট্রকে ধর্মহীন করিয়া পরিচালিত করিলে তাহার পরিণাম ভয়ঙ্কর সর্বনাশের কারণ হইতে বাধ্য। আমরা শক্তিবাদ গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া শক্তিবাদ বুঝিতে অনুরোধ করি এবং শক্তিবাদ মঠের বিভিন্ন পূজা ও উৎসবে যোগদান করিয়া উচ্চ সংস্কার ও ধর্মানুশীলনের দ্বারা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করিতে বলি।

ভারতের নেতারা রাষ্ট্রনীতিকে ধর্মহীন করিতে চান কিন্তু শিক্ষাকে রাজনীতি হইতে মুক্ত করিয়া স্বাধীন করিতে চান না। নেহেরু হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত নেতারাই মনে করেন শিশুরাই দেশের ভবিষ্যৎ কিন্তু সেই শিশুরা রাজনীতি ও সমাজনীতিতে প্রবেশের পূর্বে স্বাধীন বিদ্যার আলোকে সৎ বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক ও দার্শনিক অসুরবিরোধী নেতা হইয়া সমাজের ভবিষ্যৎ কর্ণধার হইয়া গড়িয়া উঠুক সেটা কিন্তু নেতারা চান না। দেশ স্বাধীন হইবার সাথে সাথে শিক্ষাকে স্বাধীন করিয়া দিলে আজ দেশে সৎ নেতার অভাব থাকিত না। এক একবার এক এক রাজনৈতিক দল ও নেতা ক্ষমতায় আসিবে এবং তাহাদের নীতি অনুসারে শিক্ষা ব্যবস্থা বদলাইবে এবং যে সব ছাত্র অন্যমত পোষণ করিবে তাহাদের মুণ্ডচ্ছেদ ও পিটাইবার ব্যবস্থা হইবে ইহা কোন সুন্দর শিক্ষা ব্যবস্থা বলিয়া মানা যায় কি? বিকাশবাদী ও সংস্কারবাদী নেতা না হইলে সেটা আশা করা যায় না কারণ ভোগবাদী নেতারা নিজেদের গদী রক্ষার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেদের স্বার্থে শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতর দিয়া যুব শক্তিকে এমনভাবে গঠন করিতে চায় যাহাতে দলীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকে।

ভারতবর্ষে ধর্মহীন রাজনীতি, ব্যক্তি-সমাজ-রাষ্ট্র - সর্বত্র যথেচ্ছভাবে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে কি খেলাধূলা, কি পড়াশুনা, কি বিজ্ঞান চর্চা সর্বত্রই সর্বনাশা রাজনীতির কবলে পড়িয়া বিভ্রান্ত, বিক্ষুব্ধ ও সর্বশেষে অচলায়তন করিয়া তুলিয়া উদ্‌ভ্রান্ত যুবশক্তির প্রচণ্ড ক্ষোভ তা ধ্বংসের কারণ হইতেছে। তাহারই প্রতিচ্ছবি আজ ভারতবর্ষ জুড়িয়া আমরা দেখিতে পাই।

যে রাষ্ট্রনীতি (রাজনীতি) ভারতবর্ষের সুষ্ঠূ রাষ্ট্র, সুষ্ঠ সমাজব্যবস্থা ও পূর্ণ মানবতা সম্পন্ন ব্যক্তি গঠনের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ সেই মহান ব্রত দূর হইয়া তাহার

পরিবর্তে যাহা ঘটিতেছে তাহার জন্য অদ্য ভারতীয় নেতাদের চোখ খুলিবার সময় আসিয়াছে।

প্রাচীন ভারতে শিক্ষা বিভাগের প্রধান ছিলেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মার মূর্তিতে আমরা চারিটি মুখ দেখিতে পাই, ইহার অর্থ তিনি চারিটি বেদ বিদ্যায় অভিজ্ঞ ছিলেন এবং ব্রহ্মার বাহন হংস, ইহার অর্থ হংস যেমন জল পরিত্যাগ করিয়া দুগ্ধ পান করে, ব্রহ্মাও মুহূর্তে বিকাশ বিরোধী নীতিকে পরিত্যাগ করিয়া বিকাশবাদী শক্তিকে গ্রহণ করিবার ও রক্ষা করিবার শক্তিতে শক্তিমান ছিলেন। মা সরস্বতীরও হংস বাহন, ইনি জ্ঞানশক্তি ও সমস্ত বিদ্যার দেবী আর ব্রহ্মা সেই বিদ্যার সমাজে সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠার মূর্ত প্রতীক। মানবের মনকেও ব্রহ্মা বলা হয়। কারণ মনই সৃষ্টি করে। সেই সৃষ্টি যাহাতে অসুর বিরোধী সৃষ্টিরূপে শিক্ষার ভিতর দিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় তাই ব্রহ্মা ছিলেন শিক্ষা বিভাগের প্রধান। যে কোন শক্তিই সমাজে প্রবেশ করে প্রথমে শিক্ষা জগৎকে কেন্দ্র করিয়া, কারণ যুবকরাই যথেষ্ট কর্মশক্তির আধার। তাহাদের চিন্তা যদিও প্রচণ্ড অন্যায় বিরোধী কিন্তু যথেষ্ট চিন্তাশীলতা না থাকায় তাহাদের অল্প সময়ে অল্প কথায় নাচাইয়া দেওয়া যায়। মধুকৈটভ বধের ইতিহাসই তার প্রমাণ। মধু ও কটু অর্থাৎ যাহা চলিতেছে ইহা কটু, আমরা যাহা তোমাদের কাছে আনিয়াছি ইহা মধু। এই ভাবেই কথা প্রথমে কাটাকাটি আরম্ভ হয় এবং সেটা সমাজের কর্ণে প্রবেশ করে এবং দুইটি দলে বিভক্ত হইয়া মারামারি আরম্ভ হয়। সেই কারণে মধুকৈটভের জন্ম সমাজের কর্ণমূলে হইয়াছে বলা হয়। কারণ যে কোন মতবাদই মানবের কর্ণমূলেই প্রথম প্রবেশ করে। ব্রহ্মা ইহা লক্ষ্য করিলেন এবং কোন রকম আক্রমণ না করিয়া ব্যাপক সমাজের পরিচালক বিষ্ণুর কাছে গেলেন, দেখিলেন বিষ্ণু মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন। সমাজ যখন নিদ্রিত হয় তখনই চোর, ডাকাত ও লুটেরুর আবির্ভাব হয়। ঠিক সেইভাবে সমাজ পরিচালক মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিলে নানা দুষ্ট মতবাদ এইভাবেই সমাজে প্রবেশ করে। ব্রহ্মা বুঝিয়া, মহামায়ার স্তব করিলেন এবং বিষ্ণু জাগ্রত হইয়া ব্রহ্মাকে সাথে লইয়া শিবের কাছে গেলেন - ত্রিকালদর্শী শিবের নির্দেশে বিষ্ণু মধুকৈটভকে বধ করিয়া শিক্ষা ও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহাই মধুকৈটভ বধের ইতিহাস। যদি রাজনীতি হইতে শিক্ষা ব্যবস্থা মুক্ত না থাকিত তবে ব্রহ্মার বিষ্ণুর কাছে যাইবার প্রয়োজন হইত না। বিষ্ণুই শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করিয়া মারামারি আরম্ভ করিয়া দিতেন। আমাদের দুর্গা মূর্তিতেও আমরা সুশিক্ষিত যুদ্ধপ্রিয় যুব শক্তির প্রতীক ও দেব সেনাপতি হিসাবে কার্তিকের মূর্তি দেখিতে পাই। গণেশ গণ-শক্তির নেতা, লক্ষ্মী ধনী ও সৎ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতীক, সরস্বতী জ্ঞানী, যোগী, ত্যাগী, শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের প্রতীক। আদিগুরু নীলকণ্ঠ শিবের নির্দেশেই মহিষাসুর বধ করিবার জন্যই এই সঙ্ঘ শক্তির উদ্বোধন করিয়াছিলেন ব্রহ্মা।

আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম মন্ত্রে দেখিতে পাই নমঃ ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায়চ জগৎ হিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। ব্রাহ্মণ অর্থে সমাজের জ্ঞানশক্তি এবং গো ঐ জ্ঞান-শক্তিকে পুষ্ট করিবার জন্য দুগ্ধ দাতাজীব। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি এবং জ্ঞান-শক্তিকে পুষ্ট করিবার জন্য গোদুগ্ধ এবং অন্নের ব্যবস্থাই চরম ব্যবস্থা এবং ইহাই ভারতের অর্থনীতির মূল। সমাজের প্রত্যেক লোক যাহাতে প্রচুর

পরিমাণে দুগ্ধ পান করিতে পারে এবং পেট ভরিয়া অন্ন পাইতে পারে এরূপ ব্যবস্থা প্রত্যেক দেশেই স্থির রাখিতে হইবে। একজন সাধারণ মজুর হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানী মহাপুরুষ এবং রাজচক্রবর্ত্তী সকলের কর্ম ও জ্ঞান শক্তি পুষ্টির সমস্ত উপাদান এই গো দুগ্ধে এবং অন্নের মধ্যে বিদ্যমান। ইহারই নাম গো ব্রাহ্মণ হিতায়। আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে। দুগ্ধদাতা গাভী সমাজের কত বড় সম্পদ এবং সেই সম্পদকে যাহারা ধর্মের নামে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে তাহারা সমাজের কত বড় সর্বনাশকারী সেটা বুঝিবার সময় আসিয়াছে। গো হত্যার ভিতর দিয়া কি ভাবে একটা উন্নত সমাজের অর্থনীতি, স্বাস্থ্যনীতি, কর্মনীতিকে আক্রমণ করিয়া ধীরে ধীরে ধ্বংস করিবার আসুরিক ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা ধর্মের ভিতর দিয়া সমাজে প্রবেশ করিয়াছিল এবং তাহার যে পরিণাম আজ আমাদের সামনে আসিয়াছে যে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি সমাজের জরাগ্রস্ত রুগ্ন অর্ধমৃত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সামনে অসহায় জনসমুদ্রের দিকে তাকাইলেই বুঝিতে পারিবেন। বর্তমান বিজ্ঞান (Science of Ecology) আজ স্বীকার করে যে গো সম্পদ আমাদের সমাজ জীবনে কতখানি প্রয়োজনীয় সম্পদ। গরুর গোবর দ্বারা বাড়ীর ছাদ লেপন করিলে বজ্রপাত রোধ হয়। গরুর গোবর দ্বারা দেওয়াল লেপন করাইলে ইহা পারমাণবিক বিক্রিয়া রোধ করে। গোরুর দুধ হইতে প্রস্তুত ঘৃত দ্বারা যজ্ঞ করাইলে সেই যজ্ঞ ধূমে বায়ুমণ্ডল পরিষ্কার থাকে ও বায়ুমণ্ডলের ভারসাম্য রক্ষা হয়। দূষিত বায়ু ও বিষাক্ত গ্যাস জমিয়া বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হইলে মেরু প্রদেশের বরফ গলিতে থাকে ইহার ফলে সমুদ্রে ও নদ নদীতে জলস্ফীতি ঘটে এবং জল প্লাবন ইত্যাদির সম্ভাবনা দেখা দেয় ও প্লাবন আরম্ভ হইলে সেই প্লাবনে সমাজের কি সর্বনাশ হইতে পারে সে কথা বলিবার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। আমাদের পূজা পদ্ধতিতে পঞ্চগব্য প্রস্তুত করিবার নিময় আছে ইহা পূজাদ্রব্য, পূজক ও পূজায় যোগদানকারীদের জীবাণুমুক্ত ও শুদ্ধিকরণের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। সেই পঞ্চগব্যের সমস্ত উপাদানই আমরা গাভী ও ষাঁড় হইতে সংগ্রহ করি। গো মূত্র ও গোময় ইহার প্রধান উপাদান। একটা গরু যে দুধ দেয় না এবং মৃত্যুপথযাত্রী সেই গরুও সারাদিনে যেটা খায় তাহার মূল্য অপেক্ষা সে গোবর ও মূত্র যাহা পরিত্যাগ করে সেটা তাহার খাদ্যের মূল্য হইতে ৭ গুণ বেশী। একথা ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার একটি সমীক্ষায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এবং মৃত্যুর পর তাহার চামড়া, হাড়, সিং সমস্ত কিছুই মহামুনি দধীচির মত সমাজের মঙ্গলের জন্যে দান করিয়া বিদায় হইয়া যায়, এমন মূল্যবান সম্পদকে যদি আমরা রক্ষা করিবার চেষ্টা না করি এবং যে সমস্ত নেতারা এই মহান সম্পদকে রক্ষা করিবার প্রয়োজন মনে করে না তাহারা নিশ্চয়ই সমাজ বিরোধী একথা বলিবার প্রয়োজন নাই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজে গোপালন করিয়া মা যশোদার সজাগ দৃষ্টিকে আড়াল করিয়াও সকলের সাথে চুরি করিয়া দুধ ও মাখন খাইয়াছেন।

তিনি সমাজকে ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ অর্থাৎ গোধনকে পালন ও রক্ষা করা ও জ্ঞানের অনুশীলন ও জ্ঞানীকে সম্মান করাই প্রকৃত সমাজসেবা ও নিষ্কাম কর্ম। সমাজের উচ্চস্তরের নেতারা যাহা অনুশীলন করিবে সমাজের সমস্ত মানুষ তাহা অনুসরণ করিবে। শ্রীকৃষ্ণ সেই কারণে গোপালন শিক্ষা দিয়া ছিলেন। শক্তি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যেই কৃষ্ণ সেই কালী অর্থাৎ শক্তিসাধনার দ্বারা

মানব বিকাশের শেষস্তরে অর্থাৎ ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং অসুর বাদের অনুশীলনে মানুষ পিশাচ রূপেও পরিণত হইতে পারে। সারা জীবন তিনি অসুর বাদের সাথে যুদ্ধ করিয়া সমাজকে শিক্ষা দিয়াছেন এমনকি নিজের বংশ অসুর নীতির সমর্থন করিয়া ছিল বলিয়া যদু বংশ ধ্বংস চক্ষের সামনে দৃঢ়তার সহিত দর্শন করিলেন এবং নিজেও চলিয়া গেলেন। বর্তমান ভারতের নেতারা একদল স্বার্থপর, ভোগবদ্ধ, পরশ্রীকাতর, হীনবীর্য্য, মিথ্যাভাষী মানুষকে পুরোহিত এবং গুরুরূপে পালন করাই ব্রাহ্মণ রক্ষা ও ধর্মের নামে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে গো হত্যাই মানব ধর্মের অঙ্গ বলিয়া মনে করেন যদিও পশু ক্লেশ নিবারণ আইন ভারতে বিদ্যমান। চুরি, ডাকাতি, মিথ্যা ছলনা, অত্যাচার, চোরা চালান, ঘুষ, ধর্ষণ এই সব মহান কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্যে এবং ঘটনা ঘটিবার পর পুলিশের তৎপরতা ও কৌশলে সবাই হিন্দি ফিলিমের দৌলতে ব্যাপক জনসাধারণকে শিক্ষিত করিবার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করিয়া দিয়াছেন যাহাতে বড় বড় নেতাদের দুষ্কার্য্যের প্রতিবাদ করিবার জন্য একজনও অগ্রসর হইতে না পারে। কথায় আছে দেশশুদ্ধ মানুষ মারে সাক্ষী দেয় কে?

বর্তমান সময়ের অধিকাংশ নেতাই বলেন তাঁরা নাকি ধর্ম বলিতে একমাত্র মানব ধর্মকে মানেন। তাঁদের মতে মানুষই সব থেকে বড় ধর্ম, তাই যদি হয় তবে নেতারা আর-এস-এস, বি-জে-পি, সমর্থকদের মধ্যে মানব দেখিতে পান না কেন? এবং বি-জে-পি বা অন্যান্য দলই বা বিশ্বমানবের যাহারা ঠিকেদার তাদের মধ্যে মানব ধর্ম দেখেন না কেন? বর্তমান ভারতের এমন অবস্থা যে কোনরকম প্রতিবাদ ও আন্দোলন গড়িয়া উঠিবার সাথে সাথেই গুলি করিবার আদেশ দেওয়া হয় এবং নির্বিচারে লাঠি পেটা, গণ-হত্যা এবং গণ-ধোলাই, গণ-লুট তো রোজকার ঘটনা। যাহাদের উপর এইসব অত্যাচার হয় তাহাদের মধ্যে কি মানব বলিয়া কিছু নাই। যদি না থাকে তবে সেইসব অত্যাচারিত বা অত্যাচারকারী মানবের মধ্যে নিশ্চয়ই অন্য কিছু দানবীয় শক্তি রহিয়াছে। আর যদি তাই থাকে তবে সেই রহস্য না বুঝিয়া যদি নেতারা নিজেদের মহামানব মনে করিয়া মানব ধর্ম বলিয়া ভোটবাদ চালাইবার জন্য ধার্মিক ও ধর্মকে আক্রমণ করেন তবে সেটা যে নিশ্চয়ই লুটেরা সর্দারের বিড়াল তপস্বীর ছদ্মবেশ সেটা যে কোন সাধারণ ও বিবেক সম্পন্ন মানবের বুঝিতে কষ্ট হয় না।

সাধারণ মানবের মানবত্ববোধের চরম বিকাশের জন্যই মঠ, মন্দির, সাধনা-তপস্যার ধারা প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, শিক্ষা বিভাগ ছিল কেন্দ্রবিন্দু। যে সব বিদ্যার্থী জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পূর্ণত্বে প্রতিষ্ঠিত হইত তাহাদের সরস্বতী উপাধিতে ভূষিত করা হইত এবং তাহারাই পরবর্তী সময়ে শিক্ষা বিভাগের প্রধান হইতেন এবং সেই কারণেই ব্রহ্মা চারমুখ ও সৃষ্টিকর্তা বলিয়া আজও সমাজে প্রতিষ্ঠিত আছেন অর্থাৎ জ্ঞানের চরমতম অবস্থাকে মূর্তির মাধ্যমে বুঝাইবার জন্য সুরক্ষিত করা হইয়াছে। বিদ্যা ও অবিদ্যা, দেবতা ও অসুর, মানুষ ও অমানুষ, কর্ম বিজ্ঞান যদি শিক্ষা বিভাগে শিক্ষা না দিয়া সকলকে মানুষ ও দেবতা বলিয়া চালাইলে সে শিক্ষা কখনও অসুর বুদ্ধির কাছে আত্মরক্ষা করিতে পারে না। শিক্ষার ভিতর দিয়া যুবকেরা বিদ্যাও শিক্ষা করিবে এবং যত রকম অবিদ্যা আছে সেটাও শিক্ষা করিবে তাহা না হইলে অবিদ্যাবাদীরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বিদ্যাবাদীদের নাক কান সবই কাটিয়া অবশেষে সকলকে পদানত করিয়া ছাড়িবে।

সেটা অতীতেও হইয়াছে এবং বর্তমানে এমন অবস্থায় ভারত আসিয়াছে যেখানে নেতারাও আজ অবিদ্যাবাদী অসুরদের হাতে বন্দী আর সাধারণ মানুষের দুর্দশার কথা বলিবার কিছুই নাই।

এখনও যদি শিক্ষা বিভাগে পলিটিক্যাল সাইন্সে দুর্বলবাদ, অসুরবাদ ও শক্তিবাদ বিজ্ঞান পাঠ্য করিয়া দেন এবং গায়ত্রী, ব্রহ্মমন্ত্র ও মহামন্ত্র, শক্তিবাদসূত্রম্ ও ব্রহ্মনাড়ী উপাসনা ধ্যানসহ উপাসনা করিয়া ছাত্র ও শিক্ষক বিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ করেন, যেটা ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আরম্ভ করিবেন বলিয়া ছিলেন কিন্তু সে সময় অসুরবাদীরা তাঁকে দেন নাই, তিনি নিহত হন, তবে আমাদের বিশ্বাস বিশ বৎসরের মধ্যে এক সুশিক্ষিত যুব শক্তির আবির্ভাবে ভারত সত্যই স্বাধীন দেশ বলিয়া বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হইবে নচেৎ রাহুগ্রাস হইতে ভারতের আত্মরক্ষা অসম্ভব।

সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া শ্রীরামচন্দ্র বনে গিয়াছিলেন। কিন্তু তীর ধনুক ত্যাগ করেন নাই। তবে যেসব নেতা ও সাধুরা রামরাজ্যের স্বপ্ন দেখেন তাঁহাদের মুখে নিরস্ত্রীকরণের কথা শোভা পায় কিভাবে?

ধর্মের সাথে রাজনীতি মিশিয়া গেলে দেশের সর্বনাশ। ইহা নেতাদের বলিতেই হইবে কারণ গদি পাওয়ার ও রক্ষার লোভে ধর্মের নামে দেশ ভাগ করিয়াও অধার্মিক, বর্বর অত্যাচারীদের যে ভাবে প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে প্রকৃত ধর্ম শিক্ষার ভিতর দিয়া যদি জাতি ইহাদের একবার চিনিতে পারে তবে ফুলের মালার পরিবর্তে কিসের মালা জুটিবে তাহা ইহারা ভালই জানে।

১৯৮৭ সনের নবদুর্গা পূজার প্রাক্কালে শক্তিবাদ প্রবর্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী

পৃথিবীর সর্বত্র দুর্গা মায়ের পূজা হয়। শিব পূজায় অষ্টমূর্তি শিব পূজার মত মা দুর্গার অষ্ট শক্তির পূজা শাস্ত্র প্রসিদ্ধ। ইহাই মা দুর্গার ধ্যান মন্ত্রের প্রধান অংশ। অসুরের বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগের অনুশীলন ও অস্ত্র প্রয়োগই দুর্গা পূজার প্রধান লক্ষ্য। রাবণ অসুরবাদ গ্রহণ করিবার দরুণই ধ্বংস হইয়াছিলেন। রাবণ একজন হিন্দু তপস্বী ছিলেন এবং মা দুর্গার পূজক ছিলেন। ভগ্নীর প্ররোচনায় তিনি সীতা হরণ করিয়া ভুল পথে পা দিয়াছিলেন। লংকা হিন্দুরই দেশ। সেখানকার হিন্দুরা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহা হইলেও তাঁহারা সিংহলী বা সিংহ নামে প্রসিদ্ধ। ভারত মনুর দেশ। তাঁহার প্রবর্তিত সমাজই চার বর্ণ ও চার আশ্রমের হিন্দু ধর্ম। ক্ষত্রিয়গণই সিংহ বা সিংহলী নামে প্রসিদ্ধ। জওহরলাল নেহরু "হিন্দু কোড বিল" পাশ করিয়া মনুর আশ্রমে ধর্মের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই লোকটা হিন্দু, মুসলমান বা নাস্তিক ছিলেন, সেটা বিচার না করিয়াই তাঁহার কথায় নাচিয়া কংগ্রেসীরা ভারতের সর্বনাশ করিয়াছেন। হিন্দুরা হিন্দু কোড বিল ভাঙ্গিয়া দিলেই শিখদের সঙ্গে হিন্দুদের বিচ্ছেদ ভাঙ্গিয়া যায়। এই লোকটা তিব্বতকে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করেন। যখন হিন্দু কোড বিলের আন্দোলন আরম্ভ হয় তখন আমাকে হিন্দু কোড বিলের অনুকূলে বক্তৃতা দিবার জন্য কংগ্রেসী মূর্খরা বারংবার অনুরোধ করেন। আমি বলিলাম, আপনারা এই দুষ্কার্য

করিবেন না। কিন্তু কেহই শোনে নাই। সিংহলের আন্দোলনের মোড় ফেরানো প্রয়োজন ছিল। জওহরলালের বংশধর রাজীব গান্ধী কিরূপ অদূরদর্শী সেটা আমার মতো একজন সাধারণ সাধু বলিলে কে শুনিবে?

দুর্গার ধ্যান মন্ত্রে অষ্ট শক্তির উল্লেখ আছে :- ১) ওঁ উগ্রচণ্ডা, ২) প্রচণ্ডা, ৩) চণ্ডোগ্রা, ৪) চণ্ডনায়িকা, ৫) চণ্ডা, ৬) চণ্ডাবতী, ৭) চণ্ডরূপা, ৮) অতিচণ্ডিকা। এই আট প্রকার শক্তির দ্বারা মা দুর্গা সর্বদা পরিবেষ্টিতা আছেন। সাধক এই ভাবেই মায়ের ধ্যান করিবে তবেই ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ লাভ হইবে। গান্ধীর হত্যা, ইন্দিরার হত্যা এবং অন্য অনেক নেতার পিছনে গুলি নিয়ে দৌড়া দৌড়ি এসব কি চণ্ডীর চণ্ডরূপ নয়? হিন্দু সমাজকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা বন্ধ না হইলে মায়ের এই চণ্ডরূপ কি বন্ধ হইবে? মুসলমানদের জন্য ভারত ভাগ করিয়া পাকিস্তান করা এবং পাকিস্তানীদের জামাই আদরে ভারতে রক্ষা করা কিছুতেই চলিতে পারে না। হিন্দু কোড বিল অবিলম্বে সংশোধন হওয়া উচিত। মনু হইতে জওহরলাল ও বর্তমান হিন্দু নেতারা বেশী বুদ্ধিমান ও প্রগতিশীল ইহা মনে করিবেন না।

নব দুর্গার কথা দুর্গা পূজা ও দুর্গা ধ্যানে স্থান পাইয়াছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে নব দুর্গার প্রথম দুর্গা শৈলপুত্রীর নাম রহিয়াছে। ইনি হিমালয়ের রাজা দক্ষের কন্যা। নব দুর্গার দ্বিতীয় দুর্গা ব্রহ্মচারিণী, মেয়েরা অল্প বয়স হইতে লেখাপড়া ও খেলায় মন দেয়। ব্রহ্মচারিণী বাল্যকাল হইতে শিক্ষা-দীক্ষা ও স্বভাবে ব্রহ্মচর্যের দিকে আসক্তা ছিলেন। কোন কোন মেয়েকে বাল্যকাল হইতে সাংসারিকভাবে গঠিত হইতে দেখা যায়। কেহ কেহ আবার ব্রহ্মচর্যের দিকে আকৃষ্টা থাকে। এখানে নব দুর্গার দ্বিতীয় দুর্গা যে ব্রহ্মচর্যের দিকে আকৃষ্টা ছিলেন সেটা চণ্ডীর মন্ত্রেই উল্লেখ আছে। লেখা পড়া মানে শুধু লেখা পড়া নয়, মানুষের জীবনের নীতি, ধর্ম, আত্মজ্ঞান, সমাজ এবং সমাজের উপর আসুরিক অত্যাচারের ছবিও ব্রহ্মচারিণীর মনে প্রতিষ্ঠিত থাকে। কাজেই ব্রহ্মচর্যময় জীবনের নীতিই হইতেছে আসুরিক নীতির বিরুদ্ধ মনোভাবের একটা বড় অংশ। এই জন্যই নব দুর্গার তৃতীয় চরিত্রে চণ্ডঘণ্টার কথা দেখা যায়। বালিকা কালেই ব্রহ্মচারিণীর মনোবৃত্তি অসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দিকে আকৃষ্ট ছিল। যখন যবনরা সিন্ধুর উপর আক্রমণ চালাইয়াছিল তখন হিন্দু রাজা ও নেতাদের কর্তব্য ছিল সমাজের ও জীবন বিকাশের মধ্যে যবনের বিরুদ্ধে একটা ঘোর যুদ্ধের জন্য শিক্ষানীতি প্রবর্তন করিয়া দেওয়া। এইটাই ঠিক ঠিক ব্রহ্মচর্য্যের শিক্ষা। অসুর বিরুদ্ধ মনোবৃত্তিতে ও ত্যাগবৃত্তিতে ছেলেমেয়েদের মন গড়া হিন্দু জীবনের প্রধান নীতি ছিল। সিন্ধু আক্রমণে যবনের হাতে মার খাইয়াও সেই সত্য নীতি জাগ্রত হয় নাই। আজ যে হিন্দু সমাজে অধঃপতন দেখা দিয়াছে ইহার মূলে ব্রহ্মচর্যময় জীবনে অসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধনীতি প্রচার স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়া। মা চণ্ড ঘণ্টা এত ঘণ্টা বাজাইয়া সমাজকে অসুরের বিরুদ্ধে জাগ্রত করিবার কথা থাকিলেও উহার যথাযথ ব্যাখ্যা বা শিক্ষা সমাজে হয় নাই। ইহার ফলে ব্রহ্মচারিণীর দ্বারা সমাজে যোদ্ধা বালক গঠনের দিকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা হয়, ইহাই স্কন্দমাতার কথা। সমাজে মায়েরা বুঝিলেন যে তাঁহাদের সন্তানগণকে যোদ্ধা মনোবৃত্তিতে গঠন করা প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণের জীবনে বাল্যকাল হইতেই অসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধনীতি প্রতিষ্ঠিত ছিল। কাত্যায়ণী দেবী শ্রীকৃষ্ণের জীবন গঠনের এই নীতিকে শ্রদ্ধা করিতেন।

এই জন্য স্নেহ আদর করিয়াছিলেন। যখন দেখা গেল চণ্ড ঘণ্টা দেবীর যুদ্ধের ঘণ্টা বালক ও যুবকদের মধ্যে প্রতিফলিত হয় নাই ইহা দেখিয়াই তিনি স্কন্দ মাতা হইয়া সমাজের বালকদের মধ্যে যুদ্ধনীতি প্রবর্তনের কথা ভাবিলেন। এই জন্যই তিনি কার্তিক মাতা বা স্কন্দ মাতা এবং বালক কৃষ্ণকে স্নেহদায়িনী মহা শক্তি। সমাজ গঠনের এই সুন্দর নীতি প্রত্যেক হিন্দুর পরিবারে আবার বালকগণের মনে জাগ্রত হওয়া প্রয়োজন। এই জন্য দেবী দুর্গা স্কন্দ মাতা, যুদ্ধের নীতি বিফল দেখিয়াই সমাজ মাতা দুর্গা বুঝিলেন যুবকগণকে ও বালকগণকেও নতুনভাবে গঠিত করিতে হইবে এবং সমাজের উপর ইহাদের উচ্ছৃঙ্খল ও আসুরিক মনোবৃত্তির পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ সমাজ মাতা দুর্গা যুবক ও পুরুষদের কুষ্মাণ্ড নীতি পছন্দ করিতেন না, ভারতে বিগত ৪০ বছরের শাসন ও শিক্ষা-দীক্ষা যে ভয়ঙ্কর কুষ্মাণ্ড-নীতিতে পরিণত হইয়াছে ইহা যে কোন চিন্তাশীল লোক বুঝিতে পারেন। নব দুর্গার মূর্তিতে যে কুষ্মাণ্ডের কথা আছে উহার কথা শাক্তাভিষেক মন্ত্রে স্পষ্ট উল্লেখ আছে -

নাশ্যন্তু প্রেত কুষ্মাণ্ডা রাক্ষসাঃ দানবাশ্চযে।
পিশাচা গুহ্যকা ভূতা অভিষেকেন তাড়িতাঃ॥

অর্থাৎ প্রেত, কুষ্মাণ্ড, রাক্ষস, দানব, পিশাচ ও গুহ্যকাভূত অর্থাৎ গোপনে গোপনে যাহারা অসুরের পক্ষে শক্তিবাদীর বিরুদ্ধে প্রচার করিয়া বেড়ায় তাহারা সকলে নাশ প্রাপ্ত হউক ও বিতাড়িত হউক। এই সব উপাদানগুলিই কুষ্মাণ্ড রাজনীতির ভিন্ন ভিন্ন রূপ। ইহারা কেহই সমাজের মঙ্গল কারী নয়।

সমাজের উপর অসুরবাদীদের অত্যাচারকেই লক্ষ্য করিয়াই দক্ষ কন্যা কুমারী দেবতাদের পক্ষে এবং দেবত্ব রক্ষায় যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। ইহাই চণ্ডী গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ের কথা।

পঞ্চম হইতে ত্রয়োদশ পর্যন্ত সব অধ্যায়গুলি দেবীর অসুরের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর যুদ্ধের ইতিহাসে পরিপূর্ণ। চণ্ডী গ্রন্থের এই অধ্যায়গুলিই মায়ের তৃতীয় রূপ বলিয়া পরিচিত। চণ্ডীর নব দুর্গা রহস্য উদ্ঘাটনে নবম রূপে সিদ্ধিদাত্রী মা কালীর কথা আছে। একটি কুমারী বালিকা যদি সত্যিই শক্তিবাদের ভিত্তিতে গঠিত হইতে পারে তবেই সিদ্ধিদাত্রী কালীমাতার মত তার জীবনের নীতি চণ্ডীর তৃতীয় রূপের ইতিহাসের কাহিনীতে পরিণত হইবে। সিদ্ধিদাত্রীর চার হস্তের এক হস্তে শঙ্খ - ইহা অসুরের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর যুদ্ধের ঘোষণা। (গীতার প্রথম অধ্যায়ে ১২-১৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। মায়ের অন্য হস্তে চক্র। অসুর সমাজের বিরুদ্ধে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্র (সংগঠন) নিয়োজিত হইয়াছিল। ইহাই দেবীর হস্তের চক্র। এই সব চক্রের মধ্যে থাকিয়া যাহারা যুদ্ধ করিবেন সেইসব কৃপাণধারী যোদ্ধারাই মায়ের হাতের কৃপাণ বা যুদ্ধাস্ত্র। এই যুদ্ধে যোগী, ঋষি, তপস্বী ও সন্ন্যাসীরাও নামিতে বাধ্য হইবে। ইহাই দেবীর হস্তের ত্রিশূল। একটা কুমারীর জীবন কিরূপভাবে ভয়ঙ্কর একক যুদ্ধে নিয়োজিত হইয়াছিল এবং কিরূপভাবে তিনি অস্ত্রে শস্ত্রে শিক্ষিতা হইয়াছিলেন ইহারই বিস্তৃত বিবরণ চণ্ডী গ্রন্থে মায়ের তৃতীয় রূপের বর্ণনায় বর্ণিত আছে। সত্যযুগে দেবাসুর যুদ্ধে, ত্রেতায় রাম রাবণের যুদ্ধে, দ্বাপরের কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে একই চণ্ডী চরিত্র প্রতিষ্ঠিত ও ভূষিত হইয়াছে।

ভারতের লিঙ্গকাটা যবন এবং নাস্তিকদের তাণ্ডবনৃত্য ভারতের কোণায় কোণায় জাগিয়া উঠিয়াছে। ইহার পরিণতি ভয়ঙ্কর - দেবাসুর যুদ্ধেরই ইঙ্গিত। পৃথিবীর সর্বত্র মা দুর্গার পূজা এখনও অনুষ্ঠিত হয়। কাজেই সমাজ যুদ্ধের কাহিনী এখানেই শেষ হইবে না। দুর্গার ধ্যানের শেষ অংশে উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ড নায়িকা, চণ্ডা ও চণ্ডবতীর কথা স্থান পাইয়াছে।

উগ্রশ্চণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা।
চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা॥

(দ্রঃ - শক্তিবাদীয় দুর্গাপূজাবিধি, পৃঃ ৬)

বর্তমানে '৮৭ সনে নাস্তিক ও যবনের তাণ্ডবনৃত্য ভালভাবেই ভারতে দেখা দিয়াছে। দুর্গা পূজা, নব দুর্গা পূজা ও চণ্ডীপাঠ সর্বত্র হইতেছে। ইহার পরিণতিতে রক্ত বিপ্লবের নীতিও সমাজের সামনে আসিবে। নেতারা নিজেরা উগ্রপন্থী বা মহাউগ্রপন্থী বা কুষ্মাণ্ড ইহারও প্রমাণ হইবে।

যেভাবে ভারতে কংগ্রেস ও কমিউনিষ্টদের মুসলীম তোষণ ও শাসননীতি চলিয়াছে ইহার পরিণতিতে ভারতে উগ্রনীতি ব্যাপকভাবে দেখা দিবে, একথা ভালভাবে নেতারা জানিয়া রাখুন। আপনারা জানিয়া রাখুন ভারতে মা দুর্গার আবির্ভাব অনিবার্য। আমরা নাথুরাম গড্‌সেকে সমালোচনা করিতে পারি। গান্ধীর বিরুদ্ধে তখনই উগ্রনীতি প্রয়োগের চেষ্টা না করিয়া যদি চণ্ড নীতিতে ভারতকে সংগঠিত করিতে চেষ্টা করিতেন, আমাদের মতে তাহাতে বেশী কাজ হইত। ইন্দিরা কি কখনও ভাবিতে পারিতেন যে তিনি ৩৬টি গুলিতে ঝাঁঝরা হইয়া জীবন দিবেন? আমরা ইহা ভালভাবে জানি কুষ্মাণ্ড নীতিতে রাজ্য শাসন চলে না। শাসকগণের সৎ নীতিতেই প্রতিষ্ঠিত থাকা বেশী প্রশংসনীয়।

শাস্ত্রে আছে - "নানা রূপ ধরে দেবী।" - ভারতে অধ্যাত্মবাদ-বিরোধী অসুররা, যবন, সেকুলার, খিলাফৎবাদী, সর্বধর্মবাদী, নাস্তিকবাদী ইত্যাদি নানারূপে দেখা দিলেও হিন্দুর হতাশ হইবার কিছুই নাই। কারণ মা দুর্গাও নানারূপে ভারতের দিকে দিকে আবির্ভূতা হইতেছেন। ইঁহাদের কাহারও হাতে ত্রিশূল, কৃপাণ, কুক্‌রী, তীরধনুক ইত্যাদি। আবার অত্যাধুনিক অস্ত্র হাতেও অনেকেই নামিতেছেন। হিন্দু সমাজের রক্ষায় একদিন ইহারা সকলেই সঙ্ঘবদ্ধ হইবে এবং অসুরের সব রূপেরই বিনাশ হইবে।

১) দুর্গা পূজায় জাতিভেদ নাই। ২) হিন্দুরা সিংহ হও। কর্মভেদ নিশ্চয় কোন জাতিভেদ নহে। সিংহ বাহিনী দুর্গা মূর্তি সব শ্রেণীর হিন্দুদের সংঘ শক্তির প্রতীক। লক্ষ্মী - ধন-সম্পদ, খাদ্য ও ঐশ্বর্যের প্রতীক। সরস্বতী - জ্ঞান, বিদ্যা, শিক্ষা, কলার প্রতীক। কার্তিক - যোদ্ধা যুব সঙ্ঘের প্রতীক। গণেশ - গণশক্তি এবং বিজয় না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধে লাগিয়া থাকার মূর্তি। নবপত্রিকা - নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধ, খাদ্যশস্য ও ফলফুলের প্রতীক। নীলকণ্ঠ শিব - সিদ্ধ ও শক্তিধর গুরুর প্রতীক। সমুদ্র মন্থনে ইনি কণ্ঠে বিষ ধারণ করিয়া দেবতাদের রক্ষা করিয়াছিলেন। দুর্গামায়ের দশ হাতে ১১টি অস্ত্র রহিয়াছে। ১) ত্রিশূল - সন্ন্যাসীদের অস্ত্র। ২) খড়্গ - যুদ্ধরত সৈনিকের অস্ত্র। ৩) চক্র - নারায়ণের অস্ত্র। নারায়ণ মানে নরশ্রেষ্ঠ বা সমাজকর্তা। চক্র অস্ত্র বিশ্বকর্মার দ্বারা সূর্যরশ্মি হইতে প্রস্তুত হইয়াছিল। (দ্রঃ - কাম্যকবন অধ্যায়, মহাভারত)। ৪) তীক্ষ্ণবাণ -

সমস্ত বনবাসী হিন্দুদের অস্ত্র। ৫) শক্তি - ইহা অ্যাটমিক অস্ত্র। পাশুপৎ, জৃম্ভন, চক্র, বজ্রবাণ, শক্তিশেল সবই অ্যাটমিক অস্ত্র। ৬) খেটক্ - লাঠি বা গদা - ব্রহ্মচারীদের অস্ত্র। নরসিংহের হস্তে গদা দেখানো হইয়াছে। এক হস্তে অসুরের চুল ও অন্য হস্তে গদা দ্বারা মস্তকে প্রহার দেখানো হইয়াছে। ৭) পূর্ণচাপ - ধনুষ্, গাণ্ডীব, হরধনু। ইহা বর্তমানে সাঁওতালদের অস্ত্র। রামায়ণের যুগে ইহা রাম লক্ষ্মণের অস্ত্র ছিল। ৮) পাশ - নাগপাশ। সাপুড়িয়া বা সর্প ব্যবসায়ীর অস্ত্র। ৯) অংকুশ - হস্তীচালক মাহুতদের অস্ত্র। ১০) ঘণ্টা - পুরোহিতের অস্ত্র। ১১) পরশু - কুঠার - কাঠুরিয়াদের অস্ত্র।

হিন্দুদের মধ্যে নানা জাতির অস্ত্রগুলি দেবীর হস্তে রহিয়াছে। দেখা যাইতেছে, ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া গিরিবাসী, বনবাসী, কাঠুরিয়া, সাঁওতাল, সাপুড়ে সকলেই দুর্গা মূর্তিতে সঙ্ঘবদ্ধ। সুতরাং ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান যে মায়ের পূজায় জাতিভেদ নাই।

মহাষ্টমীতে সন্ধি পূজাই সন্ধি প্রস্তাব এবং সন্ধি ভঙ্গেই নবমীতে মহিষাসুর বধ।